২২-০৬-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - 'জগৎ অম্বা', যিনি সকলের আশা পূরণকারী কামধেনু স্বরূপ, ওনার পুত্র-কন্যা তোমরা। অতএব, সকলের মনোকামনা পূর্ণ করাই তোমাদের কর্তব্য। আর অন্যান্য ভাই-বোনেদেরও সঠিক দিশা দেখাতে হবে।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, বাবা কি এমন গুরু-দ্বায়িত্ব দিয়েছেন তোমাদের ?

উত্তর :- বাচ্চারা, বেহদের অলৌকিক বাবা যেহেতু তোমাদের বেহদের অলৌকিক সুখ দেওয়ার জন্য এসেছেন- সেহেতু তোমাদেরও কর্তব্য হল, প্রতিটি ঘরেই বাবার আসার খবর পৌঁছে দেওয়া। বাবার সহযোগী বাচ্চা হয়ে, প্রতিটি ঘরেই স্বর্গের পরিবেশ বানানো আর কাঁটা তুল্য পতিতকেও ফুলের তুল্য পবিত্র করে তোলার সেবা। বাবার মতন নিরহংকারী, নিরাকারী ভাবে থেকেই সবার সেবা করতে হবে। তোমাদের সব চেয়ে গুরু দ্বায়িত্ব হল, রাবণের মতন শত্রুর থাবা থেকে, বিশ্বের সবাইকে মুক্ত করা।

গীত :- মাতা, ও মাতা, তুমিই সবার ভাগ্য বিধাতা।

ওঁম্ শান্তি ! জগৎ মাতার এই গীত-গাঁথার মহিমা কেবল ভারতেই হয়ে থাকে। জগৎ অম্বাই সদা কালের প্রকৃত ভাগ্য-বিধাতা। তাই তো ওনাকে কামধেনুও বলা হয় -যার অর্থ যিনি সবার সর্ব প্রকার মনোকামনাকে পূর্ণ করেন। কিন্তু, তা পূর্ণ করার জন্য সেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা উনি পান কার থেকে ? জগৎ পিতা এবং জগৎ অম্বা উভয়েই সেই বর্সা পান শিববাবার থেকেই। বাচ্চাদের এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে, প্রকৃত অর্থে আমি আত্মা। আত্মা দেখতে পায় না, কিন্তু বোধ-শক্তি আছে। জীব আর আত্মা = জীবাত্মা। আত্মা অবিনাশী, কিন্তু শরীর (জীব) বিনাশী- যার চোখ দ্বারা আত্মা দেখতে পারে। সাক্ষ্যাৎকার এই আত্মারই হয়। শোনা যায়, আত্মার সাক্ষ্যাৎকার স্বামী বিবেকানন্দেরও হয়েছিল। কিন্তু উনি তা বুঝে উঠতে পারেননি। তোমরা বি কে-রাও ভেবে থাকতে পারো, বাবাকে যেমন দেখতে পাও, তেমনই নিজের আত্মাকেও দেখতে পাবে। যেখানে, আত্মা যেমন হবে- তেমনই তো হবে আত্মার পিতা পরমাত্মাও। এক্ষেত্রেও কোন তফাৎ নেই। বুদ্ধি দিয়ে অবশ্যই তা বোঝা যায়- কে বাবা আর কে বাচ্চা। বাচ্চারা অর্থাৎ আত্মারা তো সেই বাবা-পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। কিন্তু এই চর্মচক্ষে আত্মা বা পরমাত্মা কারওকেই দেখা যায় না। উনি ভগবান, অর্থাৎ পরম আত্মা, যিনি পরমধাম নিবাসী, মহত্তম সর্বোচ্চ পরমাত্মা। ভক্তি-মার্গে যারা নানা উপাচারে ভক্তি করেন, তাদের কারও কারও সাক্ষ্যাৎকার হয়। কিন্তু, এর অর্থ এমন নয় যে, আত্মা সেই সময়ে তার শরীরে প্রবেশ করেছে। আত্মা তো চলে যায় আবার অন্য শরীরে পুনঃজন্ম নিতে। ভক্তি-মার্গে যে যেই স্বরূপকে, যে ভাবনায় যাকে পুজা করে- তারই সাক্ষ্যাৎকার হয়। লোকেরা বসে বসে এই যে এত বিভিন্ন প্রকারের চিত্রাদি বানিয়েছে, তা যেন বাচ্চাদের পুতুল খেলার পুজা। তবে হ্যাঁ, তার প্রতি বিশ্বাস রাখলে উপহার হিসাবে অল্পকালের সামান্য সুখ অবশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই বেহদের অলৌকিক সুখ, যা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। তোমরা জানো যে, তোমরাই স্বর্গের বাদশাহী পেয়ে থাকো। ভক্তি করে কেউ স্বর্গে যেতে পারে না। ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ রূপে শেষ হবার পর, অর্থাৎ পুরোনো দুনিয়ার কলিযুগের শেষ যখন হয়, তখন নতুন দুনিয়া অর্থাৎ সত্যযুগ আসে। এটাই তাদের কারও বুদ্ধিতে ঢোকে না। সন্ন্যাসীরা আবার কারও কারও বেলায় এমনও বলে, উনি তো জ্যোতির

আলোতে মিশে গেছেন। বাস্তবে কিন্তু এমন কিছু হয় না। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধির মত পাচ্ছো- যাকে শ্রীমৎ বলা হয়। কত সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ এটা। যা শ্রী শ্রী ভগবান স্বয়ং বলেন। একমাত্র উনিই পারেন স্বর্গের মালিক বানাতে অর্থাৎ সাধারণ নর থেকে নারায়ণ বানাতে। তোমরা এই শ্রীমতের দ্বারাই বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য পাও। শ্রী শ্রী ১০৮-এর মালার অনেক মহিমা। আবার ৮- রত্ন-মালার আরও বেশী মহিমা। জাগতিক সন্ন্যাসীরা যেগুলিকে জপ করে। তারা কাপড়ের থলি দিয়ে গরুর মুখের একটা আকৃতি বানিয়ে তাকেই 'গোমুখ' বলে বোঝায়। আর তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মালা জপতে থাকে। আর এই বাবা সেখানে বলেন নিরন্তর স্মরণ করতে, অথচ তারা সেখানে তার অর্থ করে নিয়েছে মালার জপ। বাচ্চারা, তোমরা তো জানতেই পেরেছো, পারলৌকিক বাবা স্বয়ং এসে ব্রহ্মার মাধ্যমে, তোমাদেরকে নিজের করে নিয়েছে। প্রজাপিতা (প্রজাদের পিতা) ব্রহ্মা যখন আছেন, তবে তো প্রজা মাতাও অবশ্যই থাকবে। জগৎ অম্বাকেই জগৎ-এর মাতা বলা হয় এবং মহালক্ষ্মী অর্থাৎ বিশ্বের মহারাণী বলা হয়। বিশ্বের অম্বাই বলো আর জগৎ অম্বাই বলো - দুটোর অর্থই এক। তোমরা তারই বাচ্চা, তাই তোমরাও সেই একই পরিবার ভুক্ত হিসাবেই পরিগণিত হবে। তোমরা বাচ্চারাও ওনারই মতন সকলের মনেকামনা পূর্ণ করে থাকো। যেহেতু তোমরা জগদম্বা, জগৎ অম্বার পুত্র-কন্যা। তাই তোমাদের মন ও বুদ্ধিতে সেই আবেশের আনন্দ ভরে থাকে আর বলো আমরা অন্যদেরকেও এই সঠিক দিশা দেখাবো। যদিও এটা খুবই সহজ রাস্তা। অথচ ভক্তি মার্গের দিশা কত সঙ্কটজনক। কত প্রকারের হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করতে হয়। নদীতে গিয়ে স্নান করতে হয়। কত প্রকারের কষ্টভোগ করতে হয়। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন, "এ সব করতে করতে তোমরা হাঁফিয়ে উঠেছো।" শিববাবা স্বয়ং এসব বোঝাচ্ছেন তার বি কে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে। যারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তাদের কি সম্বন্ধ। "শিববাবা" শব্দটি খুবই শ্রুতিমধুর। তাই তোমরা 'রুদ্রবাবা' শব্দটিকে ব্যাবহার কর না। কেবল মাত্র শিববাবা অথবা বাবা বলতেই অভ্যস্ত তোমরা। কত সহজ সরল শব্দ এটা। নাম তো তার আরও অনেক আছে - কিন্তু এই "শিববাবা" নামটাই যথার্থ। শিব কথার অর্থ বিন্দু। কিন্তু রুদ্র বললে বিন্দু ভাব মনে আসে না। জগতের অন্য লোকেরাও তাকে শিব বলেই ডাকে, কিন্তু শিবের সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণাই নেই। শুধু জানে উনি শিববাবা আর তোমরা তার শালগ্রাম শিলা। বাচ্চারা, তোমাদেরকেই তা সঠিক ধারায় তাদেরকেও বোঝাতে হবে। যেমন মহাত্মা গান্ধীরা ভাবতেন, বিদেশীদের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করতেই হবে। তা ছিল জাগতিক হদের ব্যাপার। কিন্তু এটা তো বেহদের অলৌকিক ব্যাপার। তেমনি বাবাও তোমাদের এই দ্বায়িত্ব সঁপে দিচ্ছেন। বিশেষ করে এই ভারত খণ্ড সমেত সমস্ত সাধারণ দুনিয়াকেই মায়ারূপী রাবণ শত্রুর থাবা থেকে মুক্ত করতেই হবে। এই দুই শত্রুর জন্যই তোমাদের যত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাদের থেকে বিজয় প্রাপ্ত করতেই হবে। যেমন গান্ধীজীও ভারত থেকে বিদেশীদের তাড়িয়ে ছেড়েছে। তেমনি এই রাবণও অনেক বড় বিদেশী। দ্বাপর থেকেই এই রাবণের প্রবেশ করেছে, যখন কেউ তা বুঝতেই পারেনি। রাবণ এসে সমস্ত রাজ্যই ছিনিয়ে নেয়। অনেক পুরোনো বিদেশী এই রাবণ। যে ভারতকে এমন ভিখারী কাঙালে পরিণত করেছে। রাবনের রাজত্বে ওনার মতেই ভারত এমন ভ্রষ্টাচারী হয়ে পড়েছে। এই মহাশত্রুকে তাড়াতেই হবে। বাবার থেকে তোমরা সেই শ্রীমত-ই পাও, যাতে বলা আছে কিভাবে সে পালাবে। তাই বাবার সহযোগী হতে হবে তোমাদের। বাবা জানাচ্ছেন, ওনার বাচ্চা হয়ে, যদি অন্যের মতে চলো, তবে তো তোমার পতনই হবে। তখন আর উচ্চপদও পাবে না। একথাও তো প্রচলিত আছে, হিম্মতে বাচ্চা, মদতে খুদা .....। তোমরা ঈশ্বরের সহযোগী বাচ্চা। ঈশ্বর স্বয়ং এসে তোমাদের সাহায্য করেন। হে পতিত পাবন বাবা আসো বলে তো ওনাকেই ডাকতে থাকে

জগৎবাসী। তাই বাবা এসে আজ্ঞাবহের মতো উনিও তোমাদের সেবা করেন। তবেই বোঝো, বাবা কিরূপ নিরহংকারী, নিরাকারী। তোমাদেরকেও অমন নিরহংকারী, নির্বিকারী হতে শেখান। নিজেদের মধ্যে সদ্ভাভের পরিবেশ বজায় রেখে কাঁটা তুল্য পতিদেরকে ফুল তুল্য পবিত্র করে তুলতে হবে। তোমাদেরকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, কখনও কোনও প্রকার বিকারের কাজ করবে না। এই বিকারই সবারর চাইতে পুরোনো শত্রু। তাই এর থেকেই আগে জয় প্রাপ্ত করতে হবে। কোনও কোনও বাচ্চা তো এমনও লেখে যে, বাবা, আমি তো হেরেই গেলাম। কেউ আবার বলেই না। এতে যেমন নিজের নাম বদনাম হয়, সদ্গুরুরও তেমনি নিন্দা হয়। ফলে তারা নিজেরাই নিজের ক্ষতি করে। বাচ্চারা, এখন উপলব্ধি করতে পারছো, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা শিববাবার নাতি-নাতনী। যেহেতু তোমরা ব্রহ্মাবাবার বাচ্চা। তাই যেমন ব্রহ্মাবাবা শিববাবার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকেন-বাচ্চারা, তোমরাও তেমনি শিববাবার থেকেই তা পেয়ে থাকো। বাচ্চারা তো এখন এটাও জানো যে, কল্প পূর্বেও ঠিক এভাবেই বাবার থেকে সেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়েছিলে। আত্মা সবই বুঝতে পারে। আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহন করে। তখন আবার শরীরের অন্য কোনও নাম হয়। শিববাবা তো কেবল জ্ঞান দানের জন্য ব্রহ্মাবাবার শরীরকে বন্ধক (ধার) নেন। শিব-ভগবান স্বয়ং তা বলেন, অবশ্য ব্রহ্মাবাবার দ্বারা। তোমাদের অত বিস্তারে যাবার দরকার নেই, আত্মা কিভাবে শরীর ত্যাগ করে, তারপর কি হয়, কিভাবেই বা আসে, -এসব কথার মধ্যে গেলে তাতে কোন লাভও হবে না। সেসব কেবল সাক্ষ্যাৎকার মাত্র। যা কিছুই ঘটে, তার সাক্ষ্যাৎকার হয় মাত্র। সূক্ষ্ম-বতনের রাস্তা এখন খোলা-ই আছে। অনেকেই সেখানে যায় এবং আসে। যার সাথে জ্ঞান বা যোগের কোনও সম্বন্ধই নেই। ভোগ লাগলে আত্মা তখন সেখানে যায়, তাকে খাওয়াতে পান করাতে। এসব কেবল চিটচৈট্ (আচার আচরণ)। আসলে বাবা তার বাচ্চাদের খুবই স্নেহ-সুমন ভালবাসেন। বাচ্চারা, ওখানে তোমরা গিয়ে বলো, বাপদাদা আমরা এসেছি আপনার কাছে। যেখানে অবস্থান করেন শিববাবা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকে তো বলা-ই হয়ে থাকে, গ্রেট-গ্রেট গ্রান্ড ফাদার। ব্রহ্মার কুলবৃক্ষ বিশালাকার। তা শিববাবার-এমনটা কিন্তু বলা যাবে না। যেহেতু তা মনুষ্য শরীরধারীদের কুলবৃক্ষ। এছাড়া এটা মনুষ্য (ভৌতিক) জগতের ব্যাপার। ভৌতিক জগতের মধ্যে মানুষেরাই প্রধান ও এক নম্বরে। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটকও অনেক লম্বা। বাচ্চারা, তোমরা এখন যা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছো। জগতের অন্যেরা তো এসবের কিছুই বুঝতে পারে না। শেষ মুহূর্তে অবশ্য তারা এটুকু বুঝতে পারে, পরম আত্মা শিববাবা-ই সব আত্মাদের প্রকৃত পিতা। আশীর্ব্বাদী-বর্সা দাদু ব্রহ্মার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। উনিও নিজেও শিববাবার থেকেই তা পেয়ে থাকেন। আচ্ছা, ব্রহ্মাকে না হয় ভুলেই গেলে। কিন্তু বাগদানের মুহূর্তে কি কি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছিলে তোমরা ? সেক্ষেত্রেও মধ্যস্থতাকারীর কথা ভুলে যাও। যেহেতু উনি ঘটকের কাজ করে, এই অলৌকিক বন্ধনে বাঁধতে মধ্যস্থতা করেন। বাবা আবার বলছেন-ওহে বাচ্চারা, আমি তো আত্মাদের সাথেই কথা বলি। আত্মারাও তেমনি বাবাকে স্মরণ করে বলে- বাবা তুমি আসো, আমাদেরকে পবিত্র-পাবন বানাও। উত্তরে বাবা জানান- আমাকে স্মরণ করতে করতেই তোমরা পবিত্র হতে থাকবে, অন্য আর কোনও উপায়ও যে নেই। তবেই তোমরা শান্তিধামে পৌঁছতে পারবে, তারপর সেখান থেকে স্বর্গধামে পাঠিয়ে দেবো। এই শান্তিধাম তোমাদের বাপের বাড়ী-আর স্বর্গধাম হলো শ্বশুর বাড়ী। বাপের বাড়ীতে গয়না-গাঁটী পরার রেওয়াজ নেই। কিন্তু আজকাল আবার তা ফ্যাসানে পরিণত হয়েছে। তোমরা বুঝতে পেরেছো, শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে সেসব প্রচুর পরিমাণে পরতে পারবে। যেমন রীতি অনুসারে বিয়ের পূর্বে কন্যাদের সব গয়না-গাঁটী খুলে দেওয়া হয়। পুরোনো বস্ত্র পরানো হয়। শ্বশুর বড়ীতে পাঠাবার পূর্বে, বাবাও সেই রীতিতে তোমাদের শৃঙ্গার করান। আগামী

২১ জন্ম তোমাদেরকে সেই শ্বশুর বাড়ীতেই থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, তার জন্য সেরকম পুরুষার্থও করতে হবে তোমাদের। যার জন্য সম্পূর্ণরূপে পবিত্র থাকতে হবে। সংসার-গৃহাস্থলীর মধ্যে থেকেও, পদ্মফুলের মতন পবিত্র ও সুন্দর হতে হবে। যেহেতু এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। ব্যাখ্যা সহযোগে বাবা আরও বলছেন- পূর্বের ভক্তি ছিল অব্যাভিচারী সতোপ্রধান। এখন যা চূড়ান্ত তমোপ্রধানে পরিণত হয়েছে। যেমন বোম্বেতে গনেশের পুজায় লাখ লাখ টাকা খরচ হয়। তারা দেবতার মূর্ত্তি বানিয়ে তাকে চৈতন্য রূপে পূজা-অর্চনাও করে। তারপর তাকেই আবার জলে বিসর্জন দিয়ে তার বিনাশ করে। বাচ্চারা, এসব এখন তোমাদের কাছে কতই আশ্চর্যের মনে হয়-তাই না ! এ বিষয়ে জনগনকে তোমরা বোঝাতে পারো, এ আবার কি ধরণের রীতি-রেওয়াজ ? যাকে চৈতন্য দেবতা রূপে জন্ম দিলে, যাকে এত পূজা-অর্চণা-আরাধনা করে, এত ব্যঞ্জন ভোগ-প্রসাদ উৎসর্গ করলে, যা করে এত প্রসন্নও হলে- তাকেই আবার জলে বিসর্জন দিয়ে ডুবিয়ে দিলে ? সত্যি কি বিচিত্র এই রীতি-রেওয়াজ। আরও আশ্চর্যের- গাছ তুলসীর সাথে কৃষ্ণের বিয়ে দেবার ব্যাপারটা। আবার খুব ধুম-ধাম করেই সেই বিয়ে করানো হয়। বিদেশীরাও যখন এসবের গল্প-গাঁথা শোনে, তখন ভাবে -হয়ত এমনটা হলেও হতে পারে। সত্যি, জগতের মানুষেরা বসে বসে কতই না বিচিত্র কাহিনী বানাতে পারে ! যদিও এই কাহিনীগুলির মধ্যে জুয়া ইত্যাদিকে ঢোকানো হয়নি। দ্রোপদীকে বাজি রেখে, পাণ্ডবেরা জুয়া খেলেছিল -এমন কথাও তারাই বলেছে। এমন আরও আজগুবী গল্প কত কি না তারা বানিয়েছে। এর ফলেই গুরুত্বপূর্ণ রাজযোগের ব্যাপারটা একেবারেই চাপা পড়ে গেছে। এখন বাবা আবার তা জানাচ্ছেন, কেবল স্মরণের যোগ কর, যা একেবারেই সহজ ও সরল। সর্বদা মনে রাখতে হবে, তুমি ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের ক্ষীর-সাগরে যাচ্ছো। বর্তমানের এই দুনিয়াটা বিষ তুল্য বিষয় সাগরের। পুরুষার্থ করে তোমরা এখন বিষয় সাগর থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষীর সাগরের দিকে যাচ্ছো। তোমাদের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ নতুন। মানুষেরা যা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা তো বুঝতে পারছো, স্বর্গে কত সুখ-শান্তিতে থাকতে পারবে। কেবল তোমরাই সারা বিশ্ব জুড়ে রাজত্ব করবে। সেখানে কেউ তোমাদের রাজধানী ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বর্তমানে যা খণ্ড-খণ্ড হয়ে আছে। ফলে একে অপরের সাথে লড়াই-ঝগড়াতে ব্যস্ত। বাচ্চারা, তোমাদেরকেই তা বোঝাতে হবে, তোমাদের মূল শত্রু হলো রাবণ। কল্প-কল্প ধরে তোমরাই তার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে আসছো। মায়াকে জিততে পারলেই, সম্পূর্ণ জগৎকেই জেতা যায়। এই অবিনাশী নাটকটাই যে হার-জিতের খেলা। তোমরা এখন বুঝতে পারছো, জয়ী তোমরা অবশ্যই হবে। কোনও ক্রমেই ফেল হওয়া চলবে না। যেহেতু বিনাশ এখন দোরগোড়ায়। নদীগুলিতে রক্তের স্রোত-ধারা বইতে থাকবে। অহেতুক বিনা কারণেই কত শত-শতের মৃত্যু ঘটবে। তাই তো একে নরক বা ভ্রষ্টাচারী পতিত দুনিয়া বলা হয়। তখন সবাই মিলে ডাকতে থাকে, ওহে পতিত-পাবন বাবা, তুমি এসো। বাবা জানাচ্ছেন, তোমরা আত্মারা যেমন ক্ষুদ্র তারা স্বরূপ-আমিও তেমনি তারা স্বরূপ। আমিও এই অবিনাশী নাটকের বিশেষ চরিত্রে বন্ধনযুক্ত। কেউই এর থেকে মুক্ত নয়। তা না হলে কেনই বা আমি এই পতিত দুনিয়ায় আসবো। যেখানে আমি পরমধামের থাকি। এই নাটকে সবাইকে যার যার নিজস্ব কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতেই হয়। কিন্তু এতে চিন্তার কোনও কারণ নেই। তোমরা বি কে-রা এখানে নিশ্চিন্তে আনন্দের নেশায় থেকেই তা করতে পারো। যা তোমাদের কাছে খুবই সহজ-সরল ব্যাপার। বাবা তোমাদের তেমন কোনও কষ্ট করতে বলেন না। কেবলমাত্র স্মরণে থাকা এবং অন্যদেরকেও তাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগানো। বেহদের অলৌকিক বাবা বেহদের সেই অলৌকিক সুখ-ই দিতে এসেছেন। এই খবরটাই নিমন্ত্রনের মত করে, প্রতিটা ঘরেই পৌঁছে দিতে হবে। তোমাদের শুধু এটুকুই করতে হবে। বাচ্চারা, এই গুরু দ্বায়িত্বটা তোমাদের উপরই। আবার মায়ার কথাই ভাবো, সে তো ভাল যা

কিছু তার সব কিছুই ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই মায়ার কারণেই ভারত এখন কত দুঃখী হয়ে গিয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার সাহায্যকারী হয়ে, কাঁটার মতন স্বভাবধারীদেরকে ফুলের মতন পবিত্র স্বভাবের বানাতে হবে। আর তোমরাই তা জানো, আমাদের এই ব্রাহ্মণ-কুলে কি কি প্রকার স্বভাবের বাচ্চারা আছে। যেমন সেবা করবে-তেমনই পদ পাবে। আর তা না হলে, অগত্যা প্রজার পদেই যেতে হবে। যদিও সেবাতে কষ্টও কিছু হয়। কিন্তু, কত বাচ্চাই তো এই সেবার কাজে যুক্ত। বেশীর ভাগ কন্যাই এখানে আসার অনুমতি টুকুও পায় না। উপরন্তু, তাদের আবার মারধোরও করা হয়। তাই এসব কাজে সাহসেরও প্রয়োজন। ভয় পেলে চলবে না। সাহসী হতে হবে। আবার নষ্টমোহাও হতে হওয়া চাই। এই মোহ কিন্তু কোনও অংশে কম যায় না, সেও প্রবল প্রতাপশালী। কোনও বিত্তশালী ঘরের কেউ এলে, বাবা প্রথমেই তাকে দিয়ে ঘর-দুয়ার ঝাঁট দেওয়ানো, বাসন মাজানো এসব করান- দেহ অভিমানকে ভাঙ্গাবার জন্য। পরীক্ষা তো নিতেই হয়- তাই না! আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণরূপে বাবার সাহায্যকারী হতে হবে। অপরের মত বা নিজের মতে চলবে না। নষ্টমোহা হয়ে, সাহসে ভর করে সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

২) যেহেতু এখন আমরা বাপের বড়ীতে আছি- তাই এখানে অলঙ্কারের কোনও প্রকার ফ্যাসান করা চলবে না। নিজেকে জ্ঞান রত্নে ভূষিত করতে হবে, আর পবিত্র হয়ে থাকতে হবে।

বরদান:- অচল স্থিতির দ্বারা মাস্টার-দাতা হয়ে বিশ্ব-কল্যাণকারী হও।

বিস্তার :- যে অচল স্থিতির হয়, তার ভিতরে এমন শুভ ভাবনা, শুভ কামনা উৎপন্ন হয়, অন্যেও যেন তেমনি অচল হতে পারে। অচল স্থিতিধারীর বিশেষ গুণ হলো- ক্ষমাশীলতা। প্রত্যেক আত্মার প্রতি সর্বদাই দাতা ভাবের ভাবনা। তবেই সে বিশ্ব-কল্যাণকারীর বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হবে। কোনও প্রকারের আত্মার প্রতিই তার ভিতরে ঘৃণা ভাব, বিদ্বেষ ভাব, ঈর্ষা ভাব কিম্বা নিন্দা ভাব উৎপন্নই হতে পারে না। সর্বদাই কল্যাণের ভাবনা আসে।

স্লোগান :- শান্তির শক্তিই হল অন্যের ক্রোধ-অগ্নি নেভানোর সাধন।